জনশিক্ষা, গণশিক্ষা ও পারিবারিক শিক্ষা : রাষ্ট্রসংস্কারের মৌলিক ভিত্তি

মাহরুফ চৌধুরী

: সোমবার, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪

ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিকাশে শিক্ষা এমন এক অনন্য শক্তি, যা আমাদের মানবিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলিকে জাগ্রত করে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক কল্যাণে কাজ করতে উদ্‌বুদ্ধ করে।

একুশ শতকের বাংলাদেশে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের প্রয়োজন মেটাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জন-আকাক্সক্ষার প্রতিফলন হিসেবে রাষ্ট্রসংস্কারের যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে তা পূরণ করতে শিক্ষাকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। আর সেটা করতে গেলে তার মূল ভিত্তি হিসেবে শিক্ষার তিনটি ধারার- অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার তিনটি উপধারা তথা জনশিক্ষা, গণশিক্ষা ও পারিবারিক শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এ তিনটি শিক্ষা

উপধারার সমান্তরাল ও সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে সাংস্কৃতিক রূপান্তর সম্ভব, যা কেবল রাষ্ট্রসংস্কারের জন্যই নয়, বরং সমাজ জীবনের মানবিক ও সাংগঠনিক কল্যাণে সার্বিক

উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। তাই শিক্ষাকে আমাদের সমাজ পরিবর্তন ও রাষ্ট্রের অগ্রগতির বাহন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার এক বিশেষ রূপ হলো জনশিক্ষা। সহজভাবে বললে জনশিক্ষা হলো এমন এক শিক্ষাপদ্ধতি, যা সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে কল্যাণ ও অকল্যাণের, ভালো ও মন্দের, সঠিক ও বেঠিকের ধারণাগুলো সহজবোধ্যভাবে গণমানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সহায়তা করে। এটি কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমে আবদ্ধ নয়, বরং দরকারি বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানই মুখ্য। তাই জনশিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় মৌলিক ধারণাগুলোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে জনসম্মুখে তুলে ধরা। যেমন, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত মৌলিক ধারণাগুলো, নাগরিকের দায়-দায়িত্ব ও অধিকারগুলো, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবেশ সচেতনতা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে জনশিক্ষা মানুষের জীবনকে সহজ ও সুন্দর করে তুলতে পারে। কিন্তু সেটাকে অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বিত প্রয়াস হিসেবে দেখাটা পদ্ধতিগতভাবে বিশেষ ফলদায়ক। তথ্য ও

প্রযুক্তিনির্ভর বর্তমান যুগে জনশিক্ষার কার্যকর প্রয়োগে প্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডিজিটাল মাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহায়তায় এযুগে জনশিক্ষা দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য একটি সৃজনশীল ভিডিও বা জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ডকুমেন্টারি সাধারণ মানুষের উপলব্ধি, চিন্তা ও আচরণে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। জনশিক্ষা কেবল সচেতনতার মাধ্যমই নয়, বরং এটি আত্ম- উন্নয়নের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার এক বিশেষ রূপ হলো গণশিক্ষা। আমাদের সবারই জানা যে, গণশিক্ষা হলো এমন এক শিক্ষাপদ্ধতি যা সমাজের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে অক্ষর জ্ঞান তথা সাক্ষরতা প্রদানের পাশাপাশি অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে দেয়। এটি একটি সুপরিকল্পিত এবং সংগঠিত শিক্ষাপদ্ধতি, যার মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বিশেষ বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। গণশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক ইস্যুতে গণমানুষকে সচেতন করা। এটি জ্ঞান ও দক্ষতার জগতে প্রবেশের বহুমুখী প্রয়াস হিসেবে সরাসরি মানুষের জীবনের উন্নতিতে ভূমিকা রাখে। যেমন, প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতা কার্যক্রম, কর্মমুখী প্রশিক্ষণ, উৎপাদন ও আয়মুখী শিক্ষা কার্যক্রম, নারী ক্ষমতায়ন

কর্মসূচি ইত্যাদি গণশিক্ষার অন্তর্গত। গণশিক্ষার প্রসারে সামাজিক সংগঠন, এনজিও, এবং সরকারের সম্মিলিত প্রয়াস অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রেও নিত্যনতুন প্রযুক্তির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, গ্রামীণ অঞ্চলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি শেখানো বা শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা গণশিক্ষার কার্যকারিতা বাড়াতে পারে। গণশিক্ষার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এটি পরিচালিত হতে পারে এবং এটি নিরক্ষর বা সীমিত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যও সহজলভ্য ও কার্যকর হতে পারে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের আবহে আত্মগঠনের মৌলিক ও বুনিয়াদি শিক্ষা হলো পারিবারিক শিক্ষা। তাই পারিবারিক শিক্ষা হলো আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা পর্ব ও মৌলিক ভিত্তি। পরিবারের পরিবেশে শিশু তার প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করে, যা পরবর্তীতে তার ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও মানসিক গঠনে প্রভাব ফেলে। পারিবারিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো নৈতিক মূল্যবোধ, মানবিক গুণাবলি এবং আত্মশৃঙ্খলার ভিত্তি গড়ে তোলা। এটি শুধু একটি ব্যক্তিকে নয়, বরং একটি পুরো জনগোষ্ঠী বা প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করার মূল মাধ্যম। শৈশব, কৈশোর ও প্রাক-যৌবনে পারিবারিক শিক্ষা মূলত অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাই অভিভাবক ও নিকটাত্মীয়দের দায়িত্ব হলো শিশু, কিশোর ও যুবকদের সাথে সহনশীল, সহযোগিতামূলক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। বর্তমান প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা এবং আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করে অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের শিক্ষায় আরও বেশি ও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, শিশুরা যাতে সৃজনশীল কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে এবং নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পারে, সেজন্য পরিকল্পিত উপায়ে ঘরে মুখোমুখি হাতেকলমে শেখানোর পাশাপাশি আধুনিক অনলাইন শিক্ষার নানা পাটাতন বা উন্মুক্ত রিসোর্সগুলোর ব্যবহার করা যেতে পারে। রাষ্ট্রসংস্কারে শিক্ষার তিন ধারার বিশেষ করে জনশিক্ষা, গণশিক্ষা ও পারিবারিক শিক্ষা উপধারার সমান্তরাল কার্যকর প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শ ‘বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য’ প্রতিষ্ঠায় বয়সের ভিত্তিতে শিক্ষার এই তিন উপধারার সমন্বিত প্রয়াস অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে জনশিক্ষা, গণশিক্ষা ও পারিবারিক শিক্ষা একে অপরের

সম্পূরক ও পরিপূরক। যেমন, পারিবারিক শিক্ষার ভিত্তিতে জীবনের প্রারম্ভে মানুষের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে জনশিক্ষা এবং গণশিক্ষার মাধ্যমে আরও সুদৃঢ় করা যেতে পারে। আবার যার পারিবারিক শিক্ষার যথাযথ সুযোগ ছিল না, পরবর্তীতে তাকে জনশিক্ষা ও গণশিক্ষার মাধ্যমে সুনাগরিকের গুণাবলি তৈরিতে সহায়তা করা সম্ভব। শিক্ষার নানা ধারা ও উপধারার সমান্তরাল ও সমন্বিত ব্যবহার একটি রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে একটি বাস্তব উদাহরণ দেয়া যায়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জনশিক্ষা মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করবে, গণশিক্ষা তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, আর পারিবারিক শিক্ষা তাদের নৈতিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করবে। এভাবেই শিক্ষার তিন উপধারা একত্রে কাজ করলে একটি কাঙ্খিত টেকসই সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। অনুরূপভাবর আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ন্যায়বিচার, এবং মানবিকতা বিষয়ক বিষয়বস্তুগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা ছোটবেলা থেকেই মানুষকে মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করতে শেখে এবং একই সাথে পরমতসহিষ্ণুতা, সহাবস্থান, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং বৈচিত্র্যেরে প্রতি শ্রদ্ধাবোধের চর্চা করতে শেখে।

নৈতিক অবক্ষয় কবলিত সমাজে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিনির্মাণে পারিবারকে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করে তাকে সুসংহত ও কার্যকর করা অত্যাবশ্যক। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্রের সংস্কার ও উন্নতির জন্য শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়; পারিবারিক শিক্ষার উন্নয়নেও বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। পিতামাতাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা জরুরি, যেখানে তারা সন্তানদের মধ্যে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অন্যের সাথে ভাগাভাগি, সহযোগিতা, এবং ঐক্যের মানসিকতা তৈরি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবেন। এই প্রশিক্ষণ তাদের সন্তানদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। সমাজে প্রচলিত পরিবারতন্ত্রের ধারণা বদলাতে পরিবার থেকেই পরিবর্তনের সূচনা করতে হবে। পরিবারের ভেতরে সদস্যদের মাঝে

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তথা সমতা, ন্যায়বিচার, মুক্তচিন্তা, এবং সহমর্মিতার চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে। পিতামাতা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে এসব গুণাবলি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এভাবে, পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উভয় ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং মানবিক আচরণের চর্চা বিস্তৃত করা সম্ভব। রাষ্ট্রসংস্কারের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতির কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে রাষ্ট্রসংস্কারের মূল চাবিকাঠি হলো সাংস্কৃতিক রূপান্তর যা কেবল পরিকল্পিত ও সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার নানা ধারা ও উপধারার সঠিক বাস্তবায়নেই করা সম্ভব।

অতীতের সভ্যতাগুলোর দিকে তাকালেই সেটা অতি সহজেই বোঝা যায়। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় জ্ঞানীয় সমাজে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রভাবও তারই প্রমাণ। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের সমাজকে আরও উদার, সমতাভিত্তিক ও সহনশীল হতে হবে। এই রূপান্তর তখনই সম্ভব, যখন মানুষ অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আত্ম-উদ্বোধন, আত্ম-সমালোচনা ও আত্ম-সংশোধনের মাধ্যমে নিজেদের জীবনের মান উন্নত করার চেষ্টা করবে। এই

আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষর এই তিনটি উপধারার সমন্বিত কার্যক্রম রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শ ‘বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য’ বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। সাংস্কৃতিক রূপান্তরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে তারা আধুনিক চিন্তাচেতনা, মানবিক গুণাবলি এবং বিজ্ঞানমনস্কতা অর্জন করতে পারে। এ উদ্যোগ কেবল ব্যক্তিগত উন্নতিই নয়, বরং সামষ্টিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে একটি নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চাই, তবে রাষ্ট্রসংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস হিসেবে জনশিক্ষা, গণশিক্ষা, এবং পারিবারিক শিক্ষাÑ শিক্ষার এই তিনটি বিশেষ উপধারাকে আমাদের গণ-আকাঙ্খা পূরণের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ

করতে হবে। একটি টেকসই এবং সমৃদ্ধ রাষ্ট্র কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা গঠনের জন্য শিক্ষার এ তিনটি উপধারার সমন্বিত প্রয়াস ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। আমাদের সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি ধাপকে 'বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য'-কে ধারণ করার প্রেরণার উৎস হিসেবে পরিচালিত করতে হবে, যাতে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম

আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক এবং সামাজিক দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে পারে। ফলে জনগণের কাছে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের স্বার্থের চেয়ে রাষ্ট্র ও জাতীয় স্বার্থ অনেক বড় হয়ে উঠবে এবং সমাজে দুর্বৃত্তায়ণ

প্রতিরোধে সে মূল্যবোধ বিশেষ কার্যকর ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে। রাষ্ট্রসংস্কারের গণ-আকাক্সক্ষাকে মূল্য দিতে গবেষণানির্ভর সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত শিক্ষার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটানো গেলেই কেবল তা আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব ফেলা সম্ভব। আর তখন এই সাংস্কৃতিক রূপান্তরই আমাদের দেশকে একটি পুনর্গঠিত রাষ্ট্র কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা উপহার দিয়ে সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলবে যা দেশের নাগরিকদেরকে মানবিকতা এবং ন্যায্যতার ভিত্তিতে একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। তাই আবারও জোর দিয়ে বলছি, যদি আমরা রাষ্ট্র ও জনগণের উন্নতিতে গণমুখী রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা চাই, তবে প্রথমেই আমাদেরকে মনোযোগ দিতে হবে শিক্ষার এ তিন উপধারার সমন্বিত প্রয়াসে যাতে করে একটি পরিকল্পিত শিক্ষাসংস্কারে রূপরেখা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে আমরা আমাদের রাষ্ট্রসংস্কারে সেই কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হই। নতুবা আমরা যে তিমিরে আছি, সেই তিমিরেই রয়ে যাব। তিমির বিনাশী শিক্ষার আলোকে ছড়িয়ে দিয়ে জুলাই বিপ্লবের ফসল ঘরে তুলে চাই শিক্ষাসংস্কারে সরকারের সদিচ্ছা, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও জনগণের সার্বিক সহযোগিতা।

[লেখক : ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য]